তারিখ ... 25 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকত্ব হারাচ্ছে সরকার

স্বায়ত্তশাসনের নামে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা খোদ উপাচার্য—কেউই স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে পারেন না। চাকরিবিধি মান্য করেই সবার চলার কথা। কিন্তু অধুনা সরকার পক্ষ নৈরাজ্য চলতে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। সরকারের এ ধারার আচরণ ক্যাম্পাসে সংকট সৃষ্টিকারীদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। এরা বিশ্বাস করতে থাকেন আন্দোলনের নামে শিক্ষাজীবন যতই সংকটে ফেলুন না কেন, সরকার তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। সরকারদলীয় সন্ত্রাসী ছাত্ররা বিশ্বাস করে অস্ত্র উঁচিয়ে তাড়া করলেও তাদের সাতখুন মাফ হবে

জাতির জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে চালকের আসনে থাকার কথা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। কিন্তু নষ্ট রাজনীতির অপঘাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আজ বিপন্ন দশা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খাবি খাচ্ছে দলীয় ছাত্র রাজনীতি আর শিক্ষক রাজনীতির খপ্পরে পড়ে। অফিসার সমিতি, কর্মচারী সমিতি আর কর্মচারী ইউনিয়ন সকল কিছুতেই (অপ) রাজনীতিকরণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য পেশাজীবী সংগঠন রাজনীতিমুক্ত হবে এমনটা কেউ ভাবে না। কিন্তু অচিরেই এসব সংগঠন যখন জাতীয় রাজনীতির মূল দলের ইচ্ছে পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয় তখন ঘটতে থাকে বিপত্তি। তারপরও এসব চিহ্নিত রাজনৈতিক বলয়ের রূপ-কাঠামোকে না হয় একরকম মেনে নেয়া যায়। এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই। রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা দলগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর খবরদারি মানাটা অভ্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু সংকট তৈরি হতে থাকে অন্য জায়গায়। দলীয় উপাচার্য ও অন্য ক্ষমতাধররা নিজেদের অবস্থানকে শক্ত রাখার জন্য মেধা বিবেচনার বদলে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ দিতে থাকেন। ফলে উজ্জ্বল শঙ্খের পাশাপাশি অনেক পচা শামুকও ঢুকে পড়ে। এরা পরবর্তী ৩০/৩৫ বছর সংকটাপন্ন করে তোলেন শিক্ষার পরিবেশকে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থীরা। অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে গবেষণার পরিবেশ।

আওয়ামী লীগে ভাঙনের পথ ধরে একসময় ছাত্রলীগেও ভাঙন এসেছিল। মুজিববাদী ছাত্রলীগ আর জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে এনএসএফের রক্তবীজের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল। এভাবে চারা বাড়তে থাকে। ছাত্র সংঘাতের রাজনীতি জায়গা করে নিতে থাকে ক্যাম্পাসে। এ পর্যায়ে ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে যার যার দলের স্বার্থ রক্ষায় লাঠিয়ালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তখনও এতটা নষ্ট হয়ে যায়নি ছাত্র রাজনীতি। অমেধাবী বা মেধাচর্চা বিচ্ছিন্নদের স্বর্গরাজ্যেও পরিণত হয়নি। শিক্ষক রাজনীতিও ততটা দলীয় রাজনীতির আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠেনি। আশির দশকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত দলীয় সরকারগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় এর স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদায় তেমনভাবে আঘাত করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই হয়েছে। ফলে সিনেটরদের মুক্ত ভোটেই প্যানেল নির্বাচিত হতো। সকলেই চাইতেন মুক্ত মনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় পন্ডিত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন। এই প্রক্রিয়ায় সরকারও তেমন একটা হস্তক্ষেপ করেনি। ফলে এই পর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা প্রথিতযশা সর্বজনশ্রদ্ধেয় পন্ডিত শিক্ষকদের উপাচার্য হিসেবে পাই। যাঁদের চিনিয়ে দেয়ার জন্য কোনো চেষ্টা বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো না। নিজ গুণেই তাঁরা পরিচিত ছিলেন। অমন বাস্তবতায় ক্যাম্পাসে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ কলুষিত হওয়ার তেমন সুযোগ ছিল না।

ধীরে ধীরে অবস্থা পাল্টাতে থাকে। ক্ষমতার রাজনীতি গ্রাস করে রাজনৈতিক দলগুলোকে। জাতীয় রাজনীতির দলীয় ঝগড়া ক্যাম্পাসেও ছড়িয়ে যায়। তা এতটা স্থূল হতে থাকে যে, মেধাবী মননশীল ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবেই বলয় থেকে বেরিয়ে আসে। অথবা পেশিশক্তির অধিকারীদের দ্বারা পরিত্যাজ্য ঘোষিত হয়।

ক্ষমতার সুবিধা দিয়ে বিএনপি তার ছাত্রদল সাজিয়েছিল। তরুণ তুর্কিদের অস্ত্রসহ সবধরনের শক্তিতে শক্তিমান করে তোলা হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরিতে একইভাবে সক্রিয় হয় ছাত্রলীগও। জিয়াউর রহমানের কল্যাণে আর আওয়ামী লীগ রাজনীতির ব্যর্থতায় একসময় জামায়াত মাথাচাড়া দেয়। আরেক তরিকায় ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করতে থাকে ইসলামী ছাত্র শিবির। বীভৎস রগকাটা রাজনীতির জন্ম হয় এ দলের হাতে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের গ্রামগুলোতে নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করে শিবির। সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ক্যাম্পাসকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে।

এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতার মজা লুটতে গিয়ে নিজ দলের ছাত্র সংগঠন গড়েন ক্যাম্পাসে। অস্ত্র আর অর্থ ছড়িয়ে আরেক পেটোয়া বাহিনী তৈরি করা হয়। এক পর্যায়ে বেকায়দা অবস্থায় পড়ে এরশাদকে তাঁর ছাত্র সংগঠন গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। এ ধারার কলুষিত ছাত্র রাজনীতি হল দখলের রাজনীতিতে পরিণত হয়। দখলকারীর দাপট ছাত্র সংগঠনের নেতাদের অনেকটা পেশাজীবী চাঁদাবাজে পরিণত করে। তারা মদদ পায় জাতীয় দল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাছ থেকে। চাঁদাবাজিতে প্রধান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থের নেশায় উন্মত্ত সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের। তাই নিজ দলে অন্তর্কলহ বাড়তে থাকে। ছাত্র সংগঠনের হল কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সময় এলে দলগুলোতে গ্রুপিং শুরু হয়। অস্ত্রের মহড়া চলে। মারামারি, খুনোখুনির ঘটনা ঘটতে থাকে। এদের নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে পেলে-পুষে রাখে রাজনৈতিক দলগুলো। প্রগতিশীল বাম ছাত্র সংগঠনের ছাত্রছাত্রীরা একসময় মেধাচর্চা, নৈতিক মান ও আদর্শের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ছাত্রকল্যাণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতো। তাদের প্রতি সাধারণ ছাত্রদের সেই কারণে সমর্থনও ছিল। এখন আর সেই তেজ নেই। জাতীয় রাজনীতিতে বামদলগুলো লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর তার প্রভাব পড়ে ছাত্র রাজনীতিতেও। আগে বামদলের ছাত্ররা নিয়মিত পাঠ অনুশীলন করতো। মেধাবী যুক্তি-বুদ্ধি নিয়ে আন্দোলন শানাতো। এখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রায়ই ইস্যু খুঁজে বেড়ায়।

এই ছবি আজকের প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হলো ক্যাম্পাস রাজনীতির বাস্তবতাটি বোঝানোর জন্য। রাজনৈতিক সুবিধাবাদী কিছু সংখ্যক মানুষ ছাড়া এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায় এদেশের সকল মানুষ। আমাদের দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ক্যাম্পাসকে শুভছন্দে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ভূমিকাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সরকার পাল্টালে ক্যাম্পাস রাজনীতির ভোল পাল্টে যেতে থাকে। সরকার দলীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে প্রশাসন সজ্জিত হয়। ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে আসে সরকার দলীয়দের হাতে। সরকার দলীয় ছাত্রদের সঙ্গে অন্যপক্ষের সংঘাতের ঘটনা ঘটে। তবে বেশি ঘটে নিজেদের ভেতরকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সংঘাত। আন্তঃদলীয় দ্বন্দ্ব দানা বাঁধে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যেও। নানা পদ-পদবির লোভ এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। এসব দ্বন্দ্বে বিরোধী শিবিরের সমর্থন আদায় করতে মরিয়া থাকে কোনো কোনো পক্ষ। ফলে নানা সুবিধাবাদী 'আন্দোলনের' উন্মত্ত প্রকাশ ঘটে। ব্যাহত হয় শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ। জনগণের টাকায় চলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব অনাচার চলতে পারে দুটো প্রধান কারণে। একটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পদলোভী মানসিকতার অশিক্ষকসুলভ আচরণ আর অন্যটি সংকীর্ণ রাজনৈতিক লাভালাভের বিচারে সরকার পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা। এই দুর্বলতার কারণে সরকার ক্রমাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।

স্বায়ত্তশাসনের নামে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা খোদ উপাচার্য—কেউই স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে পারেন না। চাকরিবিধি মান্য করেই সবার চলার কথা। কিন্তু অধুনা সরকার পক্ষ নৈরাজ্য চলতে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। সরকারের এ ধারার আচরণ ক্যাম্পাসে সংকট সৃষ্টিকারীদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। এরা বিশ্বাস করতে থাকেন আন্দোলনের নামে শিক্ষাজীবন যতই সংকটে ফেলুন না কেন, সরকার তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। সরকার দলীয় সন্ত্রাসী ছাত্ররা বিশ্বাস করে অস্ত্র উঁচিয়ে তাড়া করলেও তাদের সাতখুন মাফ হবে। চাকরিবিধি ও শৃঙ্খলাবিধির আলোকে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা যেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সরকারের নেই। সরকার পক্ষ যেন গা বাঁচিয়ে চলতেই বেশি আগ্রহী। এসব কারণে ক্যাম্পাসগুলো ক্রমান্বয়ে অশান্ত হয়ে পড়ে। আর অভিভাবকত্ব হারায় সরকার। এমন অবস্থা থেকে দেশবাসী এখন মুক্তি চায়। এই মুক্তি পাওয়ার প্রধান উপায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর কর্তৃত্ব নয়—সরকার পক্ষের অভিভাবকত্ব বজায় রাখা। আমাদের মনে হয় সরকার অভিভাবকত্ব হারাচ্ছে এবং সংকট ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে কয়েকটি কারণে: ১. অতি রাজনীতিকরণের কারণে সরকার কাম্য দক্ষতা দেখাতে পারছে না; ২. সরকারের সংস্থাগুলো সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য দিতে ব্যর্থ হচ্ছে; ৩. সরকার ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে সঠিক আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হচ্ছে, ৪. দলীয় বিবেচনা করতে গিয়ে শিক্ষক রাজনীতির অন্যায় দাপট ও সন্ত্রাসী দলীয় ছাত্রদের আড়াল করার চেষ্টা করছে; ৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে যেসব সংগঠন সরকারকে নানা পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে সেখানে কোনো কোনো দায়িত্বশীল পদাধিকারীরা নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য কখনো কখনো বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির কোনো পক্ষের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠছেন।

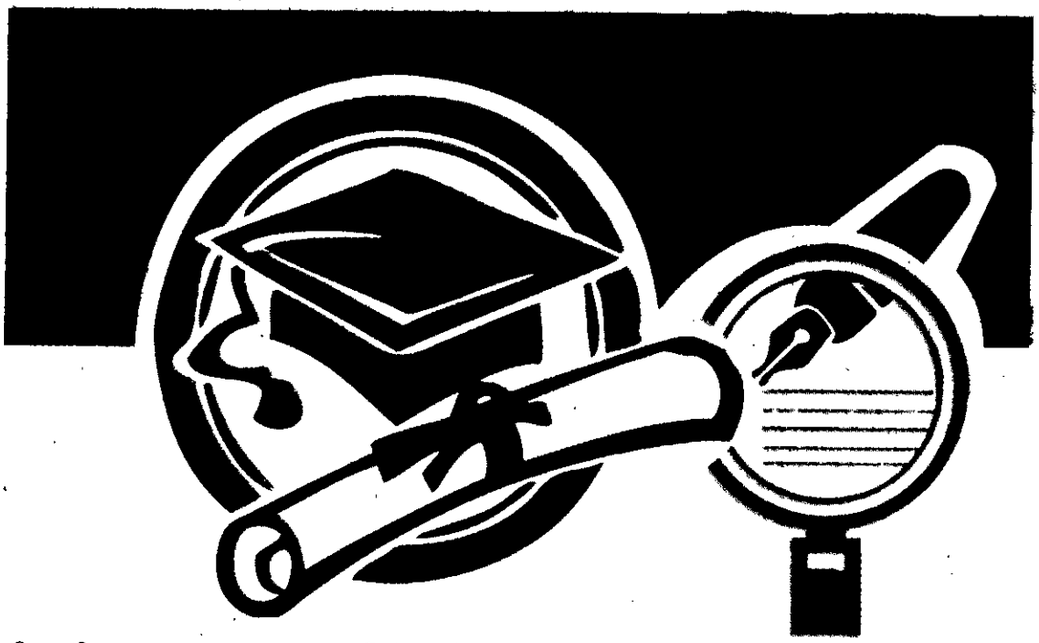

আমরা আশা করবো সরকার নিজের আর পাঁচটা অতি জরুরি কর্তব্যের ভেতর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটকেও অন্তর্ভুক্ত করবে এবং দেশের শিক্ষা পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে যথাযথ ভূমিকা পালন করে নিজ অভিভাবকত্ব বজায় রাখবে। আমরা স্বায়ত্তশাসনের মোড়কে যতই গণতন্ত্রের কথা বলি আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে গোষ্ঠীতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা। নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনীতিক শিক্ষকরা শিক্ষা ও গবেষণার পথ কন্টকাকীর্ণ করে তুলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। এমন বাস্তবতার উঠোনে দাঁড়িয়ে আমরা সরকার পক্ষকে তাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। এদেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী আর অভিভাবকের দিকে তাকিয়ে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মান ফিরিয়ে আনা এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অভিভাবকত্ব পালন করতে হবে সরকারকেই।

● লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
shahnawaz7b@gmail.com